নগেন্দ্র-নন্দিনী

শ্রীললিতমোহন সিংহ

১৩৩৫

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
বুকসেলার এণ্ড পাব্‌লিশার
২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য বার আনা

প্রকাশক—
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বুকসেলার এণ্ড পাব্‌লিশার
২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস—
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার

শ্রীযুক্ত বাবু নৃপেন্দ্র কুমার বোস

মহাশয়কে দিলুম।

যদি কোন দিন কোন স্থানে

মনে রাখি, আশুতোষ ঘোষ।

নগেন্দ্র-নন্দিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে উইলিয়াম্ বেণ্টিক্ এদেশের শাসনকর্ত্তা। সে কালে, বাঙ্গলার সর্ব্ব অঞ্চলেই দস্যু তস্করের বড়ই প্রাদুর্ভাব। নন্দীগ্রাম নামে একটী গ্রাম আছে। সেখানে এক ঘর জমিদার বাস করিতেন। জমিদার বাবুর নাম হরনাথ দত্ত। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রমানাথ ও কনিষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ। হরনাথ বড় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি দুই পুত্রের মধ্যে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন, ভবিষ্যতে, তাঁহার মৃত্যুর পর, দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্পত্তি লইয়া কলহ বাধিতে পারে। পিতা বর্ত্তমানেই, রমানাথের বিবাহ হইয়াছিল। নগেন্দ্রের বয়স অল্প থাকায়, হরনাথ তাহার বিবাহ দিয়া যাইতে পারেন নাই। রমানাথ ও নগেন্দ্রের মধ্যে বাল্যে বিশেষ সদ্ভাবই ছিল। তবে চিরদিন সমান যায় না। ভবিষ্যতে যে মনোমালিন্য হইতে না পারে, তাহার নিশ্চয়তা কি ?

পিতার মৃত্যুর পর, রমানাথের উপরেই বিষয় সম্পত্তির ভার পড়িল। কারণ নগেন্দ্রনাথ তখন নাবালক মাত্র। সম্পত্তির সে কি বুঝিবে? পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লাফালাফি ছুটাছুটি করিয়া, কাহার বাগানে বড় বড় লাল লাল পেয়ারা হইয়াছে, তাহার সন্ধানে ঘুরিয়া, তাহার দিন কাটিত।

গ্রামের মধ্যে একটা পাঠশালা ছিল। পাঠশালার গুরু ভবানী দত্ত। গুরুগিরিতে তাঁহার যথেষ্টই খ্যাতি ছিল। পাশাপাশি গ্রামের ছেলেমেয়েরা, তাঁহার নাম শুনিলে ভয়ে কাঁপিত। ভবানী দত্তের সংসারে দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠার নাম সখী। বেদগ্রামে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কনিষ্ঠা নন্দিনী, তখনও অবিবাহিতা। পিতার নিকটেই থাকিত। লোকে বলিত, নন্দিনী তাঁহার কন্যা নহে, পালিত কন্যা মাত্র। একদিন ভবানীদত্ত পথে একটা অসহায়া কন্যা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে তুলিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে স্থান দেন। সেই কন্যা কালক্রমে নন্দিনী আখ্যা পায়। লোকে যাহাই বলুক, নন্দিনী ভবানীচন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানিত। ভবানী দত্তও তাহাকে নিজ কন্যার মতই দেখিতেন। নগেন্দ্র ভবানীদত্তের পাঠশালায় পড়িতে আসিয়া নন্দিনীর সহপাঠী হইল। নগেন্দ্রনাথ গুরুমহাশয়কে কাকাবাবু বলিত। গুরুমহাশয়ও নগেন্দ্রকে পুত্রসম স্নেহ করিতেন।

দৈবক্রমে নন্দিনীর পিতার মৃত্যু হইল। রমানাথ দেখিলেন—ভ্রাতার শিক্ষক, পিতার বন্ধু, ভবানী দত্ত মারা গিয়াছেন। আপাততঃ নন্দিনী নিরাশ্রয়া। তিনি দয়াপরবশ হেতু, স্বজাতী কন্যাকে, স্বীয় গৃহে স্থান দিলেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি রহিল না। সকলে ভাবিল, নিরাশ্রয়া আশ্রয় পাইল। নন্দিনীর ভগিনী-বাড়ী হইতে অবশ্য লোক আসিয়াছিল, কিন্তু রমানাথ নন্দিনীকে পাঠান নাই। কেন—জানি না। তবে সে সময় বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "ভবানী কাকা মৃত্যুশয্যায় নন্দিনীর ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন। ইহার ভার আমার উপর রহিল। তোমাদের চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই।" তাহার পর আর লোক আসে নাই। তবে মধ্যে মধ্যে নন্দিনীর ভগিনী সখী, নন্দিনীর তত্ত্ব লইত এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইত।

কালক্রমে নন্দিনীর বিবাহের ফুল ফুটিলে, নগেন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সেও আজ বহুদিনের কথা—বিবাহের দশ বৎসর পরে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। জলভারাক্রান্ত নবীন নীরদমালা, অসীম নীলাকাশ ছাইয়া আছে। শ্বেত-পক্ষ বিস্তার করিয়া, বলাকাগণ উৎফুল্লচিত্তে আকাশমার্গে শ্রেণীবদ্ধভাবে উড্ডীন হইয়া, নববর্ষার নবীন মেঘ পুঞ্জকে অভিনন্দন করিতেছে। মন্দ পবন সংস্পর্শে, প্রফুল্লকমল-শোভিত স্বচ্ছ হ্রদ-বারি, সঙ্কোভিত হইতেছে। গুরু গুরু রবে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গর্জ্জনশীল ঘনশ্যাম হইতে, বিদ্যুৎ দীপ্তি পাইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল। নন্দিনী শয়ন কক্ষে বসিয়া বসিয়া, শ্রাবণের এই বর্ষণ-মুখর সূচিভেদ্য মসীময়ী রজনীর শোভা দেখিতেছে। কখন বৃষ্টি পতনের টুপ্‌ টাপ্‌ ঝুপ্‌ ঝাপ শব্দ একমনে শুনিতেছে। কথন অন্যমনস্কভাবে সচকিতে দরজার পানে চাহিয়া লইতেছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, সে যেন কোন আগন্তুকের অপেক্ষা করিতেছে। এমত সময়ে গৃহমধ্যে নগেন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নন্দিনীর মুখমণ্ডল হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি নন্দা—এখনও বসিয়া আছ! নিদ্রা যাও নাই?"

নন্দিনী বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল—"আজ তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন ?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—"কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম।"

হাসিয়া নন্দিনী বলিল—"আচ্ছা তুমি কি করিতেছিলে যদি বলিয়া দিতে পারি ?"

নগেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আচ্ছা বল দেখি।"

নন্দিনী—"বলিয়া দিলে আমাকে তুমি কি দিবে ?"

নগেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"অর্দ্ধেক রাজত্ব আর তিন কন্যা দান করিব।"

নন্দিনী—"না সত্য করিয়া বল না—আমাকে কি দিবে ?"

নগেন্দ্রনাথ নন্দিনীকে ডাকিলেন। ডাকিয়া তাহার গণ্ডের নিকটে স্বীয় ওষ্ঠ লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই দিব।"

নন্দিনী নগেন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া, দূরে সরিয়া গিয়া, রাগতভাবে বলিল, "যাও—।"

"তবে যাই" বলিয়া নগেন্দ্রনাথ দরজার পানে যাইতেছিলেন। নন্দিনী ডাকিল—"শোন। কোথায় যাইতেছ ?"

নগেন্দ্র—"তুমি যে যাইতে বলিলে।"

নন্দিনী—"না আর যাইতে হইবে না।"

নগেন্দ্র—"তাহা হইলে বল, আমি কি করিতেছিলাম।"

নন্দিনী—"দুই জন ভদ্রলোকের সহিত গল্প করিতেছিলে, না?"

নগেন্দ্র—"তুমি জানিলে কি প্রকারে?"

নন্দিনী—"আমি কাছারী ঘরের খিড়কীর ফাঁক দিয়া একবার দেখিয়া আসিয়াছি।"

নগেন্দ্র হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"আজ এত তাগিদ কেন?

"আছে। দেখবে? দেখ।" বলিয়া নন্দিনী একখানি পত্র নগেন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিল, "আজ এই পত্রখানি দিদির নিকট হইতে আসিয়াছে।"

নগেন্দ্রনাথ পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

"স্নেহের নন্দা—আজ কতদিন তোমাকে দেখি নাই। তোমাকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তুমি বোধহয় আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ কেন, বর পাইলে স্ত্রীলোক সকলকে ভুলিয়া যায়? পূর্ব্বে তোমার পত্র পাইতাম, আজ কাল তুমি একখানাও পত্র দাও না কেন? তুমি একবার আসিবে? শ্রীনাথ 'মাসী মাসী' বলিয়া ডাকে। শ্রীনাথ কে—জান? আমার খোকাবাবু। তোমার সহিত অনেক কথা আছে। তুমি আসিলে সকল কথা বলিব। নগেন্দ্র ও তুমি কেমন আছ? তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমার দেবর সুরেশকে তোমাকে আনিতে পাঠাইলাম। আসিতে ভুলিবে না।" ইতি

তোমার বড় দিদি—

পত্র পাঠান্তে নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—"সুরেশ ত আসিয়াছে। তুমি যাইবে নাকি?"

নন্দিনী হাসিয়া বলিল—"হুজুরের হুকুম হইলে দাসী যাইতে পারে।" নন্দিনীকে পাঠাইতে নগেন্দ্রের অভিমত ছিল না। কিন্তু নন্দিনী কিছুতেই ছাড়িল না। নগেন্দ্রনাথ অগত্যা বলিলেন—তাহা হইলে কল্য প্রাতে যাও। দিনও ভাল আছে।" বলিয়া নগেন্দ্র গৃহ ছাড়িয়া কাছারীতে গমন করিলেন। এবং কল্য প্রাতে পাল্কী প্রস্তুত থাকিবার আজ্ঞা দিয়া, আবার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

নন্দিনী বলিল—"তুমি যাইবে না।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না—তুমি যাও। আজ কাল বৈষয়িক কাজে বড় ব্যস্ত আছি।" নগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে যাইবার জন্য নন্দিনী অনেক অনুরোধ করিতে লাগিল। "কল্য প্রাতে যাহা হইবার হইবে। আজি রাত্রি হইয়াছে নিদ্রা যাও।" বলিয়া নগেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনী গভীরা। আকাশ ঘোর কাল মেঘে ছাইয়া আছে। পেচক গম্ভীর আরাবে ডাকিয়া উঠিল। নগেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন ; হঠাৎ তিনি মুখ বিকৃতি করিয়া উঠিলেন নিদ্রাবস্থায় হাত তুলিয়া যেন কাহাকে কি বলিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহা আমরা জানি ; কারণ প্রাতে তিনি নন্দিনীকে স্বপ্ন সম্বন্ধে বলিতেছিলেন—আমরা শুনিয়াছি। সেই অদ্ভুত বিস্ময়কর ও ভীতিপ্রদ স্বপ্ন বিবরণ শুনিলে শিহরিতে হয়।

স্বপ্ন বিবরণ এইরূপ। "নগেন্দ্রনাথ ও নন্দিনী নৌকারোহণে যেন কোথায় যাইতেছেন। বেলা অধিক হওয়ায়, রন্ধন করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা এক স্থানে নৌকা বাঁধিলেন। যে স্থানে নৌকা বাঁধিলেন, সেই স্থান হইতে সমুদ্র অতি নিকটে। সুতরাং সেই স্থানের নদীর প্রসারণও অধিক। এক কূল হইতে অন্য কূল, অতি অস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তীরোপরি, অসংখ্য অরণ্যজাত বৃক্ষ রাজি জন্মিয়া রহিয়াছে। নৌকায় রন্ধনের সমস্ত উপকরণই পর্য্যাপ্ত ছিল, কেবল যে সকল আনাজ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন,—দেখিলেন প্রায় সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছে।

আনাজ লইয়া আনিবার মানসে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের অনুসন্ধানে তীরোপরি আরোহণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে—দূরে একটী গ্রাম দেখিতে পাইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে আনাজ পত্র লইয়া তীরে ফিরিয়া আসিলেন। দূর হইতে, গভীর জলকল্লোল শুনিতে পাইয়াছিলেন। নদীর তীরে আসিয়া দেখিলেন—ঘোর গর্জ্জনে, মহাবেগে, উত্তাল তরঙ্গে, নদীতে জোয়ার আসিয়াছে। ঐরূপ জোয়ার সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্দাম জলস্রোতে, তাঁহার তরণীখানীর কাছি ছিঁড়িয়া গেল। তরণী উল্কা বেগে ছুটিয়া চলিল। উত্তাল তরঙ্গে একবার উর্দ্ধে উঠিল, একবার নামিল, আবর্ত্তে ঘুরিল। হঠাৎ ঈষৎ কাৎ হইল, তারপর অসীম জলমধ্যে নিমজ্জিত হইল—আর উঠিল না। আবার দেখিলেন—এক তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি দূরে—জলমধ্য হইতে উঠিল, হস্ত সঞ্চালন, করিয়া এক অবোধ্যভাষায় নগেন্দ্রকে কি বলিল। নগেন্দ্রনাথের কিছুই বোধগম্য হইল না। সেই উত্তাল তরঙ্গময়ী নদীবক্ষ হইতে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইল।”

এ দৃশ্য দেখিয়া, নগেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, গৃহ অন্ধকার। ভাবিলেন, বোধ হয় আমি সাগরগর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছি। তাঁহার ভয় সঞ্চার হইল। গাত্র দিয়া স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। হস্ত দ্বারা অনুভবে জানিলেন—পার্শ্বে নিদ্রিতা যুবতী ভার্য্যা শয়ন করিয়া আছে। যদ্যপি তাঁহার মানসিক উদ্বেগ কিঞ্চিৎ উপশমতা প্রাপ্ত হইল, তথাপি তিনি উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া আলোক প্রজ্জ্বলিত করিলেন। আলোক সাহায্যে দেখিলেন—নন্দিনী নিদ্রিতা। সুন্দর মুখখানির চতুর্দ্দিকে কুঞ্চিত অলকদাম আসিয়া পড়িয়াছে। দুই ওষ্ঠের সংযোগ স্থলে, ওষ্ঠের বিচ্ছেদ হেতু, মুক্তার ন্যায় দুই একটী দন্ত দেখা যাইতেছে। চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত। পদ্মপলাশলোচন যুগলোপরি মনোহর ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে। কি সুন্দর! হঠাৎ কেন, কোন অজ্ঞাত আশঙ্কায়, নগেন্দ্রের বিশাল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এক দৃষ্টে, অনেকক্ষণ সেই নিদ্রিত মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া অনেক ক্ষণ দেখিলেন। অতঃপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আলোক নিভাইলেন ও শয়ন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে পাল্কী প্রস্তুত হইল। দ্বারবানেরা মস্তকে লাল লাল পাগ্‌ড়ি জড়াইয়া, মোটা মোটা বংশ দণ্ড হস্তে লইয়া, পায়ে নাগরা জুতা পরিয়া গোঁফে তা দিতে দিতে, মস্‌ মস্‌ করিয়া হাজির হইল। তাহারা বিদেশে যাইবে কি আনন্দ! দাসী গালে দোক্তা পান টুঁসিয়া পুঁটলী বগলে উপস্থিত হইল, যেন তীর্থ-পথের-যাত্রী। ক্রমে বিদায়ের সময় ঘনাইয়া আসিল। নন্দিনী নগেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতে গেল। নগেন্দ্রনাথ নন্দিনীর হস্ত ধরিয়া ডাকিলেন—"নন্দা।"

নন্দিনী বলিল—"কি?"

নগেন্দ্রনাথ—"তোমাকে পাঠাইতে আমার মত ছিল না। কেন—জানি না। তবে যখন যাইতেছ, যাও কিন্তু দেখিও সাবধানে যাইও।"

নন্দিনী রহস্য করিয়া বলিল, "সে ভয় করিও না, তোমার নন্দা—তোমার চরণ দর্শন না করিয়া মরিবে না।"

নগেন্দ্রের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। গত রাত্রের স্বপ্ন বিবরণ মনে পড়িল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

নগেন্দ্র বলিলেন—"ছিঃ! ও কথা মুখে আনিতে নাই"

নন্দিনী মনে মনে লজ্জিতা হইল। নগেন্দ্রের সজল চক্ষুর পানে চাহিয়া ভাবিল—বড়ই অন্যায় করিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল—"নাথ! তুমি অমঙ্গল চিন্তা করিতেছ কেন?"

নগেন্দ্রনাথ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—"কি জানি নন্দা—আমার মনে কেন এ চিন্তা জাগিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে—যেন তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না।"

নন্দিনী বলিল—"ও সকল কথা মনে স্থান দিও না। আমি তেছি—আবার ফিরিয়া আসিব।"

এমন সময়ে দাসী আসিয়া খবর দিল—"পাল্কী প্রস্তুত হইয়াছে।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—"তবে যাও।"

স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া নন্দিনী বলিল—"আসি।"

নন্দিনীকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া, তাহার রাঙ্গা ওষ্ঠে নগেন্দ্রনাথ চুম্বন করিলেন। তাহার পর নন্দিনী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিল। পাল্কী চলিয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যদি নন্দিনী ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে কি হইবে! তাহা কখন হইতে পারে? স্বপ্ন কখন সত্য হয়! নন্দিনী ফিরিয়া আসিবে বই কি।

ভাগ্যলক্ষ্মী, অলক্ষিতে বসিয়া বুঝি ঈষৎ হাস্য করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম হইতে বেদগ্রামে যাইতে হইলে, স্থলপথে ও জল পথে যাইতে হয়। নন্দীগ্রাম হইতে নন্দিনী পাঁচ ক্রোশ পথ পাল্কীতে গেল। তাহার পর নৌকায় আরোহণ করিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নন্দিনী নদীর শোভা দেখিতে দেখিতে চলিল। দেখিল, দুই তীরে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরোপরি শ্যামল ঘন-সন্নিবিষ্ট বনরাজি। পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায়, ঊর্দ্ধে জড়াজড়ি করিয়া, মন্দিরের শোভার অনুকরণ করিতেছে। কোথাও উহার নিম্ন দিয়া, বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে, আঁকিয়া বাঁকিয়া সরু পথ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দূরে উন্নত শীর্ষ অশ্বত্থ, বট, দেবদারু ঝাউ বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। কত প্রকারের পাখী—টীয়া, চন্দনা, ময়না, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, নীলকণ্ঠ কেহ বৃক্ষোপরি, কেহ বৃক্ষতলে বসিয়া, সেই নির্জ্জন ছায়াযুক্ত স্থানটীকে কূজন মুখরিত করিতেছিল। এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে নন্দিনী চলিল।

সূর্য্য দেব অস্ত গেলেন। সন্ধ্যার ছায়া নদীর জলে পড়িল। নদীর জল কাল হইল। মাঝিরা সমস্তদিন আহার করে নাই; তাছাড়া আজকাল জলদস্যুর বড়ই উপদ্রব, অন্ধকার হইয়াও

আসিতেছে। সুতরাং আর তাহারা অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। তীরে নৌকা বাঁধা হইল। যে স্থানে নৌকা বাঁধা হইল, সেই স্থানে নিবীড় অরণ্য। শাল, মহুযা, খর্জ্জুর, তাল, অশ্বত্থ প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষ জন্মিয়া রহিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন স্থানেও নামিল। বৃক্ষতলে কাল কুজ্ঝটিকার সৃজন করিল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা পূরবী রাগিণীতে তান ধরিয়া বসিল।

তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। নৌকায় সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইয়াছে। কেহ নিদ্রা যাইতেছে, কেহ শয়ন করিয়া আছে; কেহ হুঁকা টানিতেছে কেহ গল্প করিতেছে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল। তখন সকলে নিদ্রা গিয়াছে। আর কাহারও সাড়া শব্দ নাই। কেবল নন্দিনী জাগিয়া আছে। নৌকার কামরার গবাক্ষ খুলিয়া দিয়া, প্রকৃতি দেবীর অপরিসীম গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতেছিল। জলের কল্ কল্ ছল্ ছল্ ধ্বনি, মনযোগ সহকারে শুনিতেছিল। হঠাৎ তীরোপরি মানব-কণ্ঠ সম্ভুত স্বর যেন শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল, যেন তীরে বহু জনসমাগম হইয়াছে। নন্দিনী ভীতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল, গবাক্ষ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তথাপি ঐ আবার শব্দ! শব্দ যেন নিকটতর হইতে লাগিল, এইবার আরও নিকটে বোধ হইল। নৌকায় কেহ আরোহণ করিলে, নৌকা যেরূপ হেলিয়া উঠে, হঠাৎ নৌকাখানি সেইরূপ হেলিয়া উঠিল। মনে হইল

যেন কেহ নৌকায় আরোহণ করিল। আবার আর একজন, অতঃপর আরও একজন। এইরূপে বহুলোক নৌকায় উঠিতে লাগিল। নন্দিনী ভয়ে কাঁপিতেছে, দাসী নিদ্রিতা ছিল, নন্দিনী তাহাকে উঠাইল।

দাসী বলিল, "কি হইয়াছে ”

নন্দিনী—"বোধ হয় দস্যু নৌকা আক্রমণ করিয়াছে।"

দাসী ভয়—বিহ্বলতা হেতু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এখন উপায়।"

নন্দিনী কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে নৌকা মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

"দস্যু নৌকা আক্রমণ করিয়াছে।" বলিয়া সকলে চিৎকার করিয়া যে যেদিকে পাইল, পালাইল। কেহ জলে ঝাঁপ দিল। কেহ তীরে উঠিয়া পলাইল। কেহ নিদ্রিতের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। দস্যুগণ সুযোগ বুঝিল। যে কক্ষে নন্দিনী ছিল, সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া দেখিল—দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা পুনঃ পুনঃ দরজায় ঘা দিতে লাগিল, কেহ দরজা খুলিল না। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল—"ভিতরে কে আছে? শীঘ্র কপাট খোল।" তবুও কেহ সাড়া দিল না বা কপাটও খুলিল না। তাহারা পুনঃ পুনঃ কপাটে আঘাত করিতে করিতে কপাট ভাঙ্গিয়া গেল, দ্বার উন্মুক্ত হইল।

নন্দিনী এতক্ষণ ভয়ে কাঁপিতে ছিল। যেমনি কপাট ভাঙ্গিয়া গেল অমনি সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। দস্যুগণ কক্ষে প্রবেশ করিল। দস্যু সর্দ্দার নন্দিনীর দাসীকে দেখিয়া বলিল "তুমি কে?"

নন্দিনীকে দেখাইয়া দাসী বলিল—"আমি ইঁহার পরিচারিকা।"

দস্যু সর্দ্দার বলিল—"ইনি কে?"

দাসী ভয়বিজড়িতকণ্ঠে বলিল—"ইহাঁর নাম নন্দিনী। নন্দীগ্রামের জমিদার নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী।"

দস্যু সর্দ্দার—"ইনি কি মূর্চ্ছিতা?"

দাসী বলিল—"হ্যাঁ।"

দস্যু সর্দ্দার বলিল—"তবে এতক্ষণ ইহাঁর মূর্চ্ছা ভঙ্গ কর নাই কেন?" বলিয়া নন্দিনীর মস্তক স্বীয় জানুরোপরি সংস্থাপিত করিয়া, চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

নন্দিনীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, চেতনা ফিরিয়া আসিল। দস্যু সর্দ্দারের পানে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—"তুমি কে?"

সর্দ্দার বলিল—"আমার পরিচয়ে লাভ? আমি দস্যু সর্দ্দার।"

নন্দিনী—"আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে কেন?"

সর্দ্দার—"দোষ কি?"

নন্দিনী—"দোষ কিছুই নয়, আমার প্রাণে লাভ?"

সর্দ্দার—"লাভ ক্ষতি জানি না, তবে রক্ষা করিতে হয় তাই করিয়াছি।"

নন্দিনী নীরব হইল। নন্দিনী প্রকৃতিস্থ হইলে, সর্দ্দার বলিল—"চল।"

নন্দিনী—"কোথায়?"

সর্দ্দার—"বুঝিতে পারিতেছ না—আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

নন্দিনী কাঁদিতে লাগিল। চক্ষে দর দর ধারা বহিতে লাগিল, নগেন্দ্রের কথা মনে পড়িল। হায়! এ কি হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের রাজত্ব কালিন্ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই দস্যু তস্করের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহারা কত লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া, বিষয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেকালে দস্যুগণ গভীর অরণ্যমধ্যে লুকাইয়া বাস করিত। সুযোগ পাইলেই, এমন কি সামান্য ধনরত্নের লোভে, মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা গভীর অরণ্যে, পরিত্যক্ত জীর্ণ দুর্গে, বাস করিত।

সুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিম তটে গভীর জঙ্গল জন্মিয়া আছে। এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে একটী দুর্গ আছে। দুর্গটী বৃহৎ ও প্রাচীন। দুর্গের প্রায় এক ক্রোশ অন্তর হইতে চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে পরিখা রহিয়াছে। দুর্গের পূর্ব্বদিকে একটী দ্বার আছে। ঐ দ্বার দিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। উক্ত দ্বার অতিক্রম করিলে, আর একটী পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পরিখা ভয়ানক গভীর ও প্রশস্ত। ঐ দ্বিতীয় পরিখায় প্রবেশ করিতে হইলে, একটী সিংহদ্বার দিয়া যাইতে হয়। দ্বারটী বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত।

দ্বারের উভয় দিকে ছয় সাত হস্ত পরিমিত প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। উক্ত দ্বার অতিক্রম করিলে, অসংখ্য বন্য বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন এক ভূখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বিভাগের পরে আর একটী পরিখা দেখিতে পাওয়া যায়। পরিখা পার্শ্বে অত্যুচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ। ঐ স্তূপ এত উচ্চ যে উহার উপরে আরোহণ করিলে, বহু দূরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ স্থানটীর পরে আর একটী পরিখা ও ভূখণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। ঐ স্থানে একটী সুবিস্তৃত নীল তোয়পূর্ণ দীর্ঘিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। দীর্ঘিকার জল কাকচক্ষুবৎ নির্ম্মল। দীর্ঘিকার এক পার্শ্বে অট্টালিকা শ্রেণী। অট্টালিকা শ্রেণী বহু পুরাতন ও জীর্ণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে সময়ে দস্যুগণ গভীর অরণ্যে, পরিত্যক্ত জীর্ণ দুর্গমধ্যে, বাস করিত। এই দস্যুগণ নন্দিনীকে উপরোক্ত দুর্গমধ্যে লইয়া গেল।

এই বৃহৎ দুর্গটী এমনই সুচারু রূপে নির্ম্মিত, বা এমনই দুর্ভেদ্য বনরাজির মধ্যে অবস্থিত যে, বাহির হইতে হঠাৎ কেহ, এখানে দুর্গ আছে বলিয়া মনে করিতে পারে না। এই দুর্গটী মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই প্রদেশের একটী প্রধান সেনানিবাস ছিল, বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। দুর্গটী পরিত্যক্ত হইলে, উহা দস্যু ও তস্করের লীলাকেতন রূপে পরিণত হয়।

হায়! এই সকল দুর্গ থাকিতে কি-না বিদেশী আসিয়া

আমাদের দেশে রাজত্ব করে। একদিন এই সকল দুর্গ বাংলার মেরুদণ্ড ছিল। আজ বাংলার সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বৃহৎ বৃহৎ তোপ পূর্ব্বের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বেকার পড়িয়া আছে। এই প্রসঙ্গে, একটী গল্প মনে পড়িল।

কোন ধনী জমিদারের এক সুন্দরী, রূপসী, শ্রেয়সী, প্রেয়সী ছিল। জমিদার মহাশয় স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। স্ত্রীর হস্তে যাবতীয় ধন সম্পত্তি গচ্ছিত থাকিত। স্ত্রীর পৈতৃক বংশে সকলে গরীব থাকায়, জমিদার বাবুর স্ত্রী গোপনে তাহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। এই সংবাদ, জমিদার বাবুর কর্ণে বিষবৎ প্রবেশ করিলে, পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাক্সের চাবি কাটিটী আমাকে দাও—যা কিছু দেখিতে পাইতেছ সকলই তোমার, কেবল চাবি কাটিটী আমার।"

আমাদেরও সেই দশা। এ দুর্দ্দশার কথা আর কত বলিব। ভাগ্যে আরও কত কি আছে—কে জানে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিনমণি অনেকক্ষণ অস্তাচলে গিয়াছেন। পৃথিবী অন্ধকার-ময়ী। রাত্রি হইয়াছে। পক্ষী-কূজন-মুখরিত—বনাণী প্রায় নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কোকিল সাড়া দিতেছে। চন্দ্রদেব আকাশে সমাসীন। একটী নির্জ্জন অট্টালিকার নির্জ্জন কক্ষে, একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী ওষ্ঠে অঙ্গুল সংস্থাপন করিয়া, গভীর চিন্তায় মগ্না। যুবতীর রূপ শরৎ কালীন্ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘস্তর হইতে আগত সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় কোমল,—প্রাণস্নিগ্ধকারী। পলাশের ন্যায় আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন যুগল নির্ম্মল সরোবরের ন্যায় টল্ টল্ করিতেছে। তন্মধ্যে ভ্রমর সদৃশ চক্ষু শোভা পাইতেছে। ইন্দ্র ধনুর ন্যায় বঙ্কিম ভ্রুযুগল কি মনোহর! তাম্বুলরাগ রঞ্জিত বিম্বাধর কি প্রাণোন্মাদকারী! কর্ণে কুণ্ডল বসন্ত মলয়ান্দোলিত লতার ন্যায় দুলিতেছে। কুঞ্চিত অলকদাম পৃষ্ঠে, কপোলে, কর্ণে, স্কন্ধে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মধুমাসে, পূর্ণচন্দ্র মেঘান্তরাল হইতে যেমত উঁকি মারে, তাহার আননখানি মুখোপরি সমাস্থত কেশদাম হইতে সেইরূপ উঁকি মারিতেছে, হাসিতেছে, শোভা পাইতেছে। কখন ঈষৎ হস্ত সঞ্চালনে, হস্তস্থিত কঙ্কণ রিণি রিণি টিণি টিণি শব্দ করিয়া উঠিতেছে। কখন মস্তকান্দোলন বশতঃ, হেমমেখলা দুলিয়া

উঠিতেছে। যুবতী আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। চিন্তার শেষ নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই। কখন আনমনে বলিতেছে—"আর কি দেখা হইবে না।" রাহুর করাল গ্রাসে পতিত চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল মলিন হইল। এই যুবতী নন্দিনী।

নানা চিন্তা করিতে করিতে নন্দিনী নিদ্রামগ্না হইল।

যে দিন দস্যুগণ নন্দিনীকে চুরি করিয়া আনিয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত, দস্যু সর্দ্দার নন্দিনীর প্রতি কোন অত্যাচার, বা এমন কোন ব্যবহার করে নাই, যাহাতে সে ভয় পাইতে পারে। দস্যু সর্দ্দার ভাবিল—এত তাড়াতাড়ি কেন? নন্দিনী ত আর পলাইয়া যাইতে পারিবে না। এখন তাহার মন চঞ্চল হইয়া আছে। এ সময় কোন কথ বলা উচিৎ হইবে না। দুই এক দিন অতিবাহিত হোক, সে আপনা হইতেই বশ্যতা স্বীকার করিবে। তাই, এতদিন দস্যু সর্দ্দার কিছু বলে নাই। অদ্য রাত্রে, সুযোগ বুঝিয়া নন্দিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, নন্দিনী শয়ন করিয়া আছে—নিদ্রা যাইতেছে। নন্দিনী অনিন্দ্যসুন্দরী রূপবতী যুবতী। কুসুমভারাক্রান্তা কুসুমিতা লতিকার ন্যায়, যুবতীর দেহও যৌবন ভারগ্রস্ত। তোয়াভারাক্রান্ত বর্ষার নব-নীরদমালার ন্যায়, যুবতীর দেহ যৌবনপরিপূর্ণা। বর্ষার নদীর ন্যায়, তাহার দেহ-কুলে যৌবন ছাপাইয়া উছলাইয়া উঠিতেছে। দেহ যৌবন-রসে ষোলকলায় পরিপূর্ণা। দস্যু সর্দ্দার

অনিমেষলোচনে সে রূপরাশি দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গেল। ভাবিল—কি করি। তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিব কি না—এইরূপ মহাসমস্যায় পড়িল। শেষে স্থির হইল—নিদ্রাভঙ্গ করা যাউক।

যে সময় নন্দিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিতেছিল—সে ও নগেন্দ্রনাথ এক রমণীয় উপবন মধ্যে বিচরণ করিতেছে। উপবনে পৃথিবীর যাবতীয় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। শিখী পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতেছে, পাপীয়া পঞ্চম স্বরে তান তুলিয়া গান করিতেছে। সে বনে কোকিল নাই। উপবন মধ্যে একটি বিস্তৃত জলাশয়ে পদ্ম, শালুক, ফুটিয়া রহিয়াছে। সুন্দর সুন্দর শ্বেতবর্ণ হংস সকল ভাসিতেছে, খেলিতেছে, সাঁতার দিতেছে। কোথাও ঝরণা হইতে ঝুর ঝুর শব্দে জল পড়িতেছে। নগেন্দ্র ও নন্দিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক পথ বাহিত করিলেন। ক্লান্তি বশতঃ নন্দিনী পথের এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। নগেন্দ্রনাথ জল আনিতে গেলেন।

এমন সময় কে, একজন অপরিচিত পুরুষ, মস্তকে পুষ্পের হার, হস্তে, কটিদেশে, গলে, সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পাভরণ; নন্দিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে ফুল ধনু! সেই আগন্তুক পুষ্প কার্ম্মুকে শর যোজনা করিয়া নন্দিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শর নন্দিনীর শরীরে বিদ্ধ হইল না। নন্দিনীর

নিকট হইতে দুই হস্ত দূরে আসিয়া পড়িল। তখন সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ, নন্দিনীর নিকটে আসিয়া, তাহার হস্ত ধারণ করিলেন; নন্দিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, দেখিয়া চিনিল—দস্যু সর্দ্দার।

নন্দিনী সজোরে হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"আপনি এত রাত্রে এখানে কেন! আমাকে কেন উঠাইলেন?"

দস্যু সর্দ্দার হাসিয়া বলিল—"কেন, দোষ হইয়াছে?"

সে হাসি নন্দিনীর বড় বিরস বলিয়া বোধ হইল, বড় ভাল লাগিল না। নন্দিনী সদর্পে বলিল—"বোধহয় জানেন পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করা মহাপাপ।"

সর্দ্দার পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "পাপ, পুণ্য, কিছুই জানি না—কেবল জানি, তুমি আমার বন্দী।"

নন্দিনী বলিল—"মানি, আমি আপনার বন্দী, কিন্তু আমার মন নয়।"

দস্যু সর্দ্দারের নিকট, এই সকল বাক্য, উন্মাদের প্রলাপের মত বোধ হইল। মানুষের মন, পাপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, ঐরূপই হইয়া থাকে। তখন পাপ, পুণ্য, বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে—না। সর্দ্দারের তাহাই হইল, সর্দ্দার নন্দিনীর প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল—"সুন্দরী! তুমি দুর্ব্বলা রমণী। তোমার ঐরূপ আস্ফালন শোভা পায় না। তুমি আমারই হইবে।"

নন্দিনী মাথায় অনেক বুদ্ধি ধরে—তাহাতে সর্দ্দার কেন, অনেককেই তাহার নিকট হার মানিতে হইবে। নন্দিনী বুঝিল—ইহার সহিত বাক্যালাপ বৃথা। এ বিপদে, কোপ প্রকাশ করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না, কৌশলের প্রয়োজন। এই স্থির করিয়া, নন্দিনী স্বীয় কোপভাব মন্ত্রবৎ দূর করিল। সহাস্য মুখের ভাণ করিয়া, কটাক্ষ হানিয়া, বলিল—"সর্দ্দার, দেখিতেছি, সত্যই তুমি আমাকে ভালবাস, তখন আর গোপন করিয়া কি হইবে। আমিও তোমাকে ভালবাসি।"

হঠাৎ মেঘ গর্জ্জন করিলে, মনুষ্য যেমন চমকিত হইয়া উঠে, সর্দ্দারও সেইরূপ চমকিত হইল। সে স্বর্গ হাতে পাইল। নন্দিনীর মুখপানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। নন্দিনী বলিতেছিল—"আমি অনেক পুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু, তোমার মত এমন বলবান, সুন্দর, ও সুগঠিত দেহ বিশিষ্ট পুরুষ, কখন দেখি নাই।" আবার সেই কটাক্ষ! সর্দ্দার ভাবিল—বুঝি সত্যই হইবে। তাহার আশ্চর্য্য কি? স্বীয় দেহের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া, বলিল—"তাহা হইলে আর বিলম্ব কেন?"

নন্দিনী—"সর্দ্দার, তুমি পূর্ব্বে আমার একটী কথা রাখিবে? স্বীকার কর।"

সর্দ্দার—"কি কথা? হাঁ রাখিব, বল কি করিতে হইবে?"

নন্দিনী—"তাহা হইলে, তুমি আমার সহিত সাত দিন সাক্ষাৎ

করিতে পারিবে না। সাত দিন গত হইলে, তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে ”

সর্দ্দার বলিল—“কেন ?”

নন্দিনী—“কেন, তা বলিতে পারিব না, আমার কথা তুমি রাখিবে, কি-না বল ?”

সর্দ্দার ভাবিল—সত্যই নন্দিনী তাহাকে ভালবাসে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। সাত দিবস মাত্র ত নয়। সাত দিন দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইবে। মন ক্ষুণ্ণ করিয়া কাজ কি ? যদি সাত দিন পরে সে আপনা হইতেই ধরা দেয়। সে স্থানে আর অধিক বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—“আমি এখন চলিলাম—সাত দিন পরে, তোমার সঙ্গে এইখানে সাক্ষাৎ করিব।”

নন্দিনী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—এখান হইতে পলাইয়া যাইবার কি কোন উপায় নাই ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুর্গমধ্যে একটী সরসী আছে। সরসীর চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিয়া রহিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, দূর হইতে সেইস্থানে সরসী আছে, বলিয়া বোধ হয় না। সরসী-জলে, পদ্ম, শালুক, নানা প্রকার জলজ ঘাস, জন্মিয়া রহিয়াছে। সরোবর তটে, একধারে, একটী বহু পুরাতন, জীর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট রহিয়াছে। সেই জীর্ণ ঘাটের সোপানোপরি, নন্দিনী বসিয়া আছে। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, তাই ত কি হইবে? ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কোন উপায়ই ত হইল না। আর যে একদিন মাত্র আছে, কি হইবে! কেমন করিয়া জগতের সম্মুখে এ কাল মুখ দেখাইব? সে ত কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। হায়! আজ সে কোথায়, আর আমি কত দূরে। যদি আজ সে আমার নিকটে থাকিত। কিন্তু সে ত নাই। তবে! তবে কি হইবে! হঠাৎ নন্দিনীর বদন গম্ভীর হইল। কপোলের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইল, কেন! নন্দিনী—তোমার মস্তক দুলিতেছে—কেন? কি সঙ্কল্প করিয়াছ? সোপান বাহিয়া ধীরে ধীরে বাপী সন্নিকটে নামিতেছ কেন? ওঃ বুঝিয়াছি, তুমি মরিবে?

ডুবিয়া মরিবে! তাই মর—ডুবিয়া মর। তবে পা কাঁপিতেছে কেন? কি! পিছাইয়া আসিলে যে! সে দিনের কথা আজ মনে পড়িয়াছে? স্বামীকে বলিয়া আসিয়াছিলে না, 'তোমার নন্দিনী তোমার চরণ দর্শন না করিয়া মরিবে না।'

তবে আবার কাঁদিতেছ কেন? মরা হইল না বলিয়া? সারা জীবন ধরিয়া কাঁদিতে আসিয়াছ, কাঁদ। দুঃখের জ্বালা চক্ষুর জলে একদিন নিভিয়া যাইবে।

নন্দিনী কাঁদিতেছে। জলে পাদস্পর্শ করিয়া, সোপানে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সে কান্নার বিরাম নাই। এমন সময় সোপানোপরি, একজন মনুষ্য আসিয়া দাঁড়াইল। অতি ধীরে, সন্তর্পণে, পা টিপিয়া টিপিয়া, সোপান বহিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। নন্দিনী জানিতেও পারিল না। ক্রমে সেই মনুষ্য, নন্দিনীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তবুও নন্দিনীর জ্ঞান নাই। সে শোকশেল কাতরা—অনাথিনী অশ্রু বিমোচন করিতেছে।

যে ব্যক্তি নন্দিনীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, সে ব্যক্তি একজন দস্যু। নন্দিনীকে এতক্ষণ গৃহ মধ্যে দেখিতে না পাইয়া, দস্যুগণের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছিল। চারিদিকে দস্যু ছুটিয়াছে। এই বৃদ্ধ দস্যুও, নন্দিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। বৃদ্ধ দস্যু নন্দিনীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ছায়া সোপান বাহিয়া জলমধ্যে নিপতিত হইল। ছায়া দর্শনে, নন্দিনী ভীতা হইয়া চমকাইয়া উঠিল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে চিনিতে পারিল না।

নন্দিনী বলিল—"কে? কে তুমি?"

দস্যু বলিল—"আমার নাম গোবিন্দ।"

নন্দিনী—"কেন—কি জন্য আসিয়াছ?"

গোবিন্দ চন্দ্র স্নেহ কোমল স্বরে বলিল, "মা তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে। আমি তোমার উপকার করিব।"

নন্দিনী—একথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল, বলিল, "উপকার! কি উপকার আমার করিবে?"

গোবিন্দ—"তোমাকে এ স্থান হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারি।" আজ ছয় দিন, নান্দনী কোন উপায়ই খুঁজিয়া পায় নাই। আজ একি!

নন্দিনী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল—"আমাকে মুক্ত করিয়া দিবে, কেন?"

গোবিন্দ—"মা—"আমাকে তোমার পিতার ন্যায় ভাবিও; আমি অন্য কিছুই প্রত্যাশা করি না। আমি দস্যু, সত্য। যাবৎ-জীবন দস্যুবৃত্তি করিয়া, আজ বৃদ্ধ হইয়াছি। কখন কোন রমণীর

প্রতি অত্যাচার করি নাই। স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতে চাই। আরও শোন! আমার এক কন্যা ছিল। তোমার মুখখানি দেখিয়া, আজ তাহার কথা মনে পড়িল। হায়! সে কত দিন।" বলিয়া বৃদ্ধ দস্যু গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। নন্দিনী চমকাইয়া উঠিল, বলিল—"তোমার কন্যা! সে কোথায়?"

দস্যু—"জানি না, সে কোথায় আছে—তাহাকে দস্যুগণ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই মাত্র জানিতাম।"

নন্দিনীর অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"পিতা—আমি তোমার সেই অভাগিণী কন্যা।"

বৃদ্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বলিল—"তুমি জানিলে কি প্রকারে?"

নন্দিনী—"আমি আমার স্বামীর মুখে শুনিয়াছি, যিনি আমাকে লালিত পালিত করিয়াছিলেন, তিনি আমার পিতা নহেন। আমি তাঁহাকে সে সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তবে আমার পিতা কোথায়? তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার পিতা এখন দস্যুবৃত্তি করিতেছেন। তাহার বেশী আর আমি কিছুই জানি না।"

গোবিন্দ বলিলেন—"মা সত্যই তুমি আমার কন্যা। তোমার

বিস্ফারিত চক্ষুতে, প্রশান্ত বদনে, তোমার মায়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি।" বলিয়া গোবিন্দচন্দ্র নন্দিনীকে স্বীয় বক্ষে টানিয়া লইয়া, স্নেহভরে তাহার কপোলে চুম্বন করিলেন। নন্দিনী কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধের চক্ষুতেও জল দেখা দিল।

নন্দিনী বলিল—"আমার মা কোথায় ?"

গোবিন্দচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"সে নাই। আজ বহুদিন মারা গিয়াছে।"

নন্দিনী কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দচন্দ্র বলিল—"মা, এখানে আর বিলম্ব করিও না। তোমাকে কক্ষমধ্যে দেখিতে না পাইয়া, সকলে তোমার অনুসন্ধান করিতেছে। কোথায় কে আসিয়া পড়িবে, এখন কক্ষে ফিরিয়া যাও। কল্য প্রাতে, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।" বলিয়া বৃদ্ধ গোবিন্দচন্দ্র কাল বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেলেন। নন্দিনী কাঁদিতে কাঁদিতে ধীর পাদ-বিক্ষেপে কক্ষে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

দস্যু কর্ত্তৃক নন্দিনী অপহৃত হইয়াছে, এ সংবাদ লোকমুখে নগেন্দ্রনাথ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। যে পত্নীকে, তিনি প্রাণের অধিক করিয়া ভালবাসিতেন, সেই স্ত্রী আজ দস্যু হস্তে নির্য্যাতিতা। বুক ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে চাহিল। বিদায়ের দিন, নন্দিনী যে সকল মর্ম্মভেদী কথা বলিয়া গিয়াছিল—আজ তাহা শেলের মত বুকে বিঁধিতে লাগিল। ভাবিলেন—কি করিয়াছি। যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর পাইব না। কেন তাহাকে যাইতে দিলাম। যে রত্ন হারাইয়াছি. তাহা সাগর খুঁজিলেও আর মিলিবে না এমনটী কার ছিল? এমন রূপবতী, গুণবতী, স্ত্রী কে—পাইয়াছে? নগেন্দ্রের মনে কত পুরাতন কথা হৃদয়ে জাগরূপ হইল। সেইদিন রাত্রে, যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে আদৌ ছিল না। আজ তাহা মনে উদয় হইল। শরীরে রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া আর ভাবিতে পারিলেন না। বসিয়া পড়িলেন। স্বপ্ন বিবরণ ভুলিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ভুলিবার জন্ত যতই চেষ্টা করিতেছিলেন, ততই আপনা হইতেই তাঁহার মনে

জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৃহের পানে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। ভয়ে ভয়ে গৃহের পানে চাহিলেন। বোধ হইল গৃহের সমস্তই যেন তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। গৃহের প্রত্যেক স্থানে নন্দিনীর কত স্মৃতি জড়িত। ভাবিলেন—হায়! এই গৃহে একদিন নন্দিনী ছিল। একদিন রাত্রে এই শয়ন কক্ষে বসিয়া কত কথা হইয়াছিল—আজ মনে হইল। একদিন নগেন্দ্রনাথ নন্দিনীকে কোন কারণ বশতঃ পদাঘাত করিয়াছিলেন। নন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। মনে হইল যেন সে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। নগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন—নন্দা! সে দিন নন্দিনী সে আহ্বানে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ উঠিল না, বসিয়াই রহিল। কেন? নগেন্দ্রের তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। বুঝিলেন এ নন্দিনী নয়, ইহা তাহার বিভীষিকা। দেখিলেন—খাটের বাজুর নিকটে নন্দিনী নাই—কেবল বড় বড় অক্ষরে লিখা রহিয়াছে 'নন্দিনী'। মনে পড়িল সেই দিন নন্দিনী মাথার কাঁটা দিয়া বসিয়া বসিয়া নিজের নাম লিখিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ অপলক নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। নন্দিনীর ছল্ ছল্ চক্ষু মনে পড়িল। তাঁহার চক্ষু জলে ঝাপ্সা হইয়া আসিল। আর দেখিতে পাইলেন না। তখন মানস-নেত্রে সেই অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যবতীকে দেখিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন

নন্দিনী কথা কহিতেছে। পথ দিয়া কোন স্ত্রীলোক মল বাজাইয়া চলিয়া গেল—মনে হইল যেন নন্দিনী হাসিতেছে। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দূরে—নারিকেল বৃক্ষ হইতে রৌদ্র সরিয়া গেল। গৃহ অন্ধকার হইল। অঙ্গণের মধ্যে রোপিত কামিনী কুঞ্জ হইতে দোয়েল তাহার সঙ্গীকে দেখিতে না পাইয়া ডাকিয়া উঠিল। নগেন্দ্র ভাবিলেন—আমার সঙ্গী কোথায়? দূরে—কোন প্রতিবাসীর গৃহ হইতে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। নগেন্দ্র বুঝিলেন—সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার মনে হইল—নন্দিনী থাকিলে সেও শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রতিবাসীদিগকে সাড়া দিত। আজ কে এই সাঁঝের বেলায় সন্ধ্যা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিতে আসিবে? নগেন্দ্রনাথ সেই খানে সেই ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—ভাবিতেই লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ভোর হইল। প্রথমে কাক ডাকিল তারপর কোকিল ডাকিল। বৃক্ষের নিম্নে জমাট বাঁধা অন্ধকার সরিয়া গেল। পূর্ব্ব গগন লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইল। ক্রমে বৃক্ষের পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। সমস্ত জগৎ আলোক পাইয়া হাসিতে লাগিল। বেলা এক প্রহর হইল। নন্দিনী স্বীয় কক্ষে বসিয়া, কল্য সন্ধ্যার ঘটনা সম্বন্ধে মনোমধ্যে আলোচনা করিতেছিল। ইনিই আমার পিতা! তবে তিনি দস্যুবৃত্তি করিতেছেন কেন? এতদিন আমার কোন সংবাদ লন নাই কেন? আমার মা কেমন ছিলেন? তাঁহাকে ত দেখি নাই। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতোছল, এমন সময়ে কক্ষ দ্বার মুক্ত হইল। মুক্ত দ্বার দিয়া গোবিন্দচন্দ্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "মা—আমি আসিয়াছি।"

নন্দিনীর মস্তক তখন চিন্তার স্রোতে আলোড়িত। কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীরবে বসিয়া রহিল। গোবিন্দচন্দ্র নন্দিনীর এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ভাব দূর করিয়া বলিলেন—"মা এখানে অধিক্ষণ বিলম্ব করা অনুচিত। এক কাজ কর।"

নন্দিনী বলিল, "কি ?"

গো—"আমার সঙ্গে আইস।"

নন্দিনী—"আমাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে যে ?"

গো—"সে চিন্তা করিও না—তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস।"

নন্দিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দ দত্ত প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিল। গোবিন্দচন্দ্র বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি। কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গৃহের পশ্চাৎ দিকে গেলেন। সেদিকে নিবীড় অরণ্য সে ধারে প্রায় কেহ যাতায়াত করিত না। পথ ধরিয়া গমন করিলে কেহ দেখিবার সম্ভাবনা সুতরাং সেই পথে চলিলেন। গুপ্তপথ গোবিন্দচন্দ্র জানিতেন সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুপ্ত-পথ ধরিয়া নন্দিনীকে লইয়া প্রথম পরিখা পার হইলেন।

এমন সময় একজন দস্যু সেই পথে যাইতেছিল। গোবিন্দ চন্দ্রকে সে চিনিত এবং নন্দিনীকে সে যে চিনিত না এমন নয়। কারণ যে দিন নন্দিনীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া আসিবার কালে যে কয়জন দস্যু ছিল সেও তাহাদের মধ্যে ছিল। দস্যু সর্দ্দারের আজ্ঞা ছিল—"যাহাতে নন্দিনী দুর্গের বাহিরে পলাইয়া না যায়—সে বিষয়ে সকলে সতর্ক থাকিবে।" সে তাহা শুনিয়াছিল। সুতরাং নন্দিনীকে গোবিন্দচন্দ্রের সহিত যাইতে দেখিয়া তাহার

সন্দেহ জন্মিল। দস্যুকে দেখিয়া নন্দিনী বড়ই ভীতা হইল। ভাবিল—'বোধ হয় আর যাওয়া হইল না।' কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র যদ্যপি কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়াছিলেন তথাপি অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিলেন। দস্যু হাঁকিয়া বলিল—"গোবিন্দ দাঁড়াও।"

গোবিন্দচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, মুখ বিকৃতি করিয়া বলিলেন—"কেন? কি জন্য দাঁড়াইব?"

দস্যু—"তুমি এই স্ত্রীলোকটীকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

গোবিন্দচন্দ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—"আমার যে স্থানে ইচ্ছা লইয়া যাইব। তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারি না।"

দস্যু—"এইরূপ বিশ্বাস ঘাতকতা করিবার উদ্দেশ্য।"

গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"উদ্দেশ্য অতি মহৎ—তোমাকে বলিব না।"

দস্যু—"তাহা হইলে আমিও তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

গোবিন্দের চক্ষুতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধ সীমা ছাড়িয়া উঠিল।

গোবিন্দের দেহে অসীম বল। গোবিন্দ দস্যুকে পদাঘাত করিলেন। সে পদাঘাত দস্যু সহ্য করিতে পারিল না। ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল। এই সুযোগে গোবিন্দচন্দ্র

নন্দিনীকে লইয়া শীঘ্রই সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। অত্যল্পকালমধ্যে দুর্গ ছাড়াইয়া নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। নন্দিনী বলিল—"পিতা, এখন কোথায় যাইব ?"

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, "মা—তোমার এখানে অধিকক্ষণ তিষ্ঠান উচিত নয়। তুমি শীঘ্রই এ স্থান হইতে চলিয়া যাও।"

নন্দিনীর চক্ষে জল আসিল, বলিল—"কোথায় যাইব ?

হাত নাড়িয়া নদীর অপর পার দেখাইয়া, গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, "নদী পার হইয়া ওপারে যাও।"

নন্দিনী—"কি প্রকারে নদী পার হইব ?"

গো—"সে বন্দোবস্ত, আমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। ঐখানে নৌকা প্রস্তুত আছে—নৌকায় আমার বিশ্বস্তলোক আছে। সে যেখানে লইয়া যাইবে—সেইখানে যাইও। কোন ভয় করিও না।"

নন্দিনী—"আপনার সঙ্গে আবার কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে ?"

গো—"কল্য প্রাতে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। যদি সাক্ষাৎ না হয়, তবে সেই লোকটীর সাহায্যে আমার সংবাদ পাইবে।" বলিয়া চলিতে লাগিলেন। যে স্থানে নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। নৌকার সমীপবর্ত্তী হইয়া ডাকিলেন—"মোহনলাল।"

নৌকার ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"যাই।"

এক ব্যক্তি নৌকা হইতে নামিয়া আসিল। নিকটে আসিলে গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন,—"শীঘ্র, খুব সতর্কে, নন্দিনীকে লইয়া যাও। কল্য প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। যদি সাক্ষাৎ না হয় তাহা হইলে আর সাক্ষাৎ হইল না জানিবে, আর অধিক বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা আসিবার কালে একটা দস্যু আমাদিগকে দেখিয়াছে। বোধহয়, এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে। আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না" বলিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

মোহনলাল অতি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—"তবে আপনার ফিরিয়া যাইয়া আর কাজ কি? আপনি পলাইয়া আসুন।"

গোবিন্দচন্দ্র বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"জানিও মোহনলাল! গোবিন্দ দত্ত এখনও এত কাপুরুষ হয় নাই যে, দোষ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে ভয় পায়!"

মোহনলাল আর দ্বিরুক্তি করিল না, নৌকা খুলিয়া দিল। গোবিন্দও দুর্গে ফিরিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিন দিন করিয়া, কতদিন কাটিতে লাগিল। কত মাস গেল, বৎসর গেল। কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তবুও নন্দিনী ফিরিল না। নগেন্দ্রের মনে শান্তি নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর শরীর ভাল থাকে না' আজ জ্বর হয়, কাল মাথা ধরে। কোন দিন আহার করেন, কোন দিন অনশনে কাটান। বাটীর সকলে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হইল। নগেন্দ্রের মাতা পুত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, বিবাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রনাথ ঐ সংবাদ পাইয়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, যে নন্দিনী গিয়াছে, সে নন্দিনীর স্থান কেহ পূরণ করিতে পারিবে না। আমি বিবাহ করিব না,—বৃথা চেষ্টা করিও না।"

নগেন্দ্রের মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহার মত ফিরাইতে পারিল না। নগেন্দ্রের নিকটে আজকাল বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, নগেন্দ্রের চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু বাহির হয়। সেই অশ্রুজল, মাতার বক্ষে শেলের মত বিঁধিতে থাকে। মাতাও কাঁদেন।

পুত্রের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া মাতাঠাকুরাণী প্রাণ

ত্যাগ করিলেন। মাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই, জ্যেষ্ঠ সহোদর রমানাথও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। নগেন্দ্রনাথ হৃদয়ে দারুণ শোক পাইলেন। তাঁহার আর শান্তি কোথায়! প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা পত্নী হারাইলেন, স্নেহময়ী মাতা ছাড়িয়া গেলেন, জ্যেষ্ঠ সহোদর শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। নগেন্দ্রনাথের সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল। বিতৃষ্ণা হইতে বৈরাগ্য, আসিয়া দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন— জগতে শান্তি কোথায়! কি করিলে শান্তি পাইতে পারেন? কি করিবেন—কি করিলে শান্তি পাইবেন, এই একমাত্র ধ্যান। একদিন নিশীথে তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন—"যেন তিনি কোন তিমিরাবৃত রজনীতে ভ্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ আকাশমণ্ডল জ্যোতিপূর্ণ হইল, সেই জ্যোতিঃপূর্ণ আকাশমণ্ডল ক্রমশঃ সূর্য্যমণ্ডলের আকার ধারণ করিল। সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে যেন শত সূর্য্য উদয় হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আবার সেই মণ্ডল মধ্যে এক শুভ্রকান্তি পুরুষচ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল। প্রত্যক্ষ পুরুষ ছায়া পরিধানে গৈরিক বসন, গলে শুভ্র পুষ্পহার, মস্তকে দীর্ঘ জটা, হস্তে কমণ্ডল। সেই দৃষ্ট পুরুষচ্ছায়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। ক্রমে নিকটে, তারপর আরও নিকটে আসিলেন। নগেন্দ্রের মস্তক আপনা হইতেই ভক্তিভাবে নত হইল, তিনি

নমস্কার করিলেন। তখন ঋষিপ্রকৃতি পুরুষচ্ছায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি চাও?"

তিনি বলিলেন—"শান্তি।"

পুরুষচ্ছায়া বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের চরণে, মন সমর্পণ কর। সংসার, নন্দিনী, সব—ভুলিয়া যাও। শান্তি পাইবে। সংসারে থাকিলে শান্তি পাইবে না।" বলিয়া ঋষিপ্রকৃতি পুরুষচ্ছায়া অদৃশ্য হইলেন।

নগেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, কোথাও কিছুই নাই—গৃহ অন্ধকার।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহার নাম শচীন্দ্র। শচীন্দ্রের হস্তে সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভার অর্পণ করিলেন। শচীন্দ্রনাথ সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক হইয়া বসিল। যখন নগেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী বেশে পথে বাহির হইলেন, তখন শচীন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল—"কাকাবাবু! এ অসময়ে আমাকে সংসার সমুদ্রে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছেন।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বাবা, দুঃখ করিও না। তুমি এখন বালক নও। বিষয়সম্পত্তি, সব বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিও, কোন বিপদই তোমার সম্মুখীন হইতে পারিবে না।"

শচীন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল, নগেন্দ্রকে প্রনাম করিয়া বলিল—"আপনার স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না।"

নগেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতেছিলেন, কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। শচীন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"শচীন্, তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়া যাইব, বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহা তুমি সম্পন্ন করিতে পারিবে?"

শচীন্দ্র সজল নয়নে বলিল, "কি? বলুন, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

নগেন্দ্রনাথের চক্ষু দিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিলেন, ক্রমে শোকবেগ কিছু উপশমতা পাইলে, হৃদয়ে স্থিরতা আসিলে, বলিলেন—"উদ্যানের মধ্যে যে প্রশস্ত ভূমি পড়িয়া আছে, ঐ স্থানে একটী সরোবর খনন করাইও। আমি পাঁচ বৎসর পরে, যদি বাঁচিয়া থাকি, ফিরিয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠা করিব। যদি উক্ত কাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি সরোবর প্রতিষ্ঠা করিও, আর সোপানোপরি মর্ম্মর স্তম্ভে নগেন্দ্র-নন্দিনী সরোবর, ক্ষোদিত করিয়া দিও" বলিয়া তিনি সে স্থানে আর দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন।

শচীন্দ্রনাথ কাঁদিতেছিল, আরও কাঁদিতে লাগিল।

নগেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন, কিন্তু পরদিন আবার পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সূর্য্য উঠিল, পক্ষী ডাকিতে লাগিল, বৃক্ষে পুষ্প ফুটিল, সৌরভ আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া ছুটিল। গন্ধে মৌমাছির আনাগোনা করিতে লাগিল—পৃথিবী হাসিতে লাগিল। কিছুরই অভাব নাই। সব আছে—কেবল নগেন্দ্র ও নন্দিনী নাই!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মোহনলাল নন্দিনীকে লইয়া নদীর অপর পারে গেল। মোহনলালের নদীর অপর পারে গৃহ আছে। সে গৃহে মোহনলাল ও তাহার কন্যা হৈমবতী থাকিত। হৈমবতী বিবাহিতা, তাহার বহুদিন বিবাহ হইয়াছে। মোহন লাল নন্দিনীকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেল। নন্দিনীকে দেখিয়া হৈমবতী বিস্মিতা হইল, বলিল—"তুমি কে ভাই?"

নন্দিনী বলিল—"আমি নন্দিনী।"

হৈমবতী—"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

নন্দিনী বলিল—"নন্দীগ্রাম।"

হৈমবতী—"তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে?" নন্দিনীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বলিল, বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হৈমবতী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—"তুমি কাঁদিতেছ কেন ভাই?"

নন্দিনী কাতরস্বরে বলিল—"ভাই! যখন আমি তাঁর কাছে বিদায় লই, সেই সময় বলিয়াছিলাম 'নন্দিনী তোমার চরণ দর্শন না করিয়া মরিবে না।'

হৈমবতী—"সে জন্ত তুমি কাঁদিও না। আবার সাক্ষাৎ হইবে, আমার মন বলিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া নন্দিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি কিছুই চাহি না, কেবল (তিনি কেমন আছেন) এ সংবাদটুকু আমাকে আনাইয়া দাও।"

হৈমবতী দেখিল, নন্দিনী শোকে বড়ই কাতরা। সস্নেহে বলিল,—"ভাই, কোন চিন্তা করিও না। অদ্যই তোমার স্বামীকে পত্র লিখিতেছি।" বলিয়া কাগজ, লেখনী ও মসীপাত্র লইয়া আসিল।

নন্দিনীকে বলিল—"লেখ, কি লিখিবে।"

আজ নন্দিনী কি পত্র লিখিতে পারে? কি করিয়া লিখিবে। কি বলিয়াই বা সম্বোধন করিবে? কত দীর্ঘ দিন পরে—আবার স্বামীকে (স্বামী) বলিয়া ডাকিবে। নন্দিনীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল, বলিল—"তুমি লিখিয়া দাও।"

নন্দিনীকে শোকে কাতর দেখিয়া হৈমবতী বলিল—"বল কি লিখিব?"

নন্দিনী—"তোমার যাহা ইচ্ছা লিখিয়া দাও।"

হৈমবতী পত্র লিখিতে বসিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া

কাটিয়া কুটিয়া একটী ক্ষুদ্র পত্র লিখিল। পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে নন্দিনীকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

হরিশপুর

শ্রীচরণকমলেষু—

পরম পুজনীয়—প্রিয়তম! বহুদিন হইল তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া যে, দুঃখ কষ্টে পড়িয়াছিলাম, তাহা আর কি বলিব। আমি আপাততঃ এইখানেই আছি। তুমি কেমন আছ? সংবাদ দিবে। কাল বিলম্ব না করিয়া পত্র পাঠ চলিয়া আসিতে ভুলিও না। ইতি—

তোমার সেবিকা—
নন্দিনী।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন হইয়াছে?"

নন্দিনী বহুদিন স্বামীকে পত্র লিখে নাই, আজ কতদিন পরে পত্র লিখিতেছে। পত্র শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল, অঞ্চলের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"বেশ হইয়াছে, তবে একটী কথা লিখিতে ভুল করিয়াছ।"

হৈমবতী "কি?"

নন্দিনী—"আমার যে গুরু, সেই স্বামীকে আমার প্রণাম

জানাও নাই। পত্র শেষে লিখিয়া দাও 'দাসীর অসংখ্য প্রণাম জানিবে।'"

হৈমবতী ভাবিল, এত স্বামী ভক্তি। পত্র শেষে নন্দিনীর কথামত লিখিয়া দিল। এমত সময়ে গৃহ মধ্যে মোহনলাল আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার মুখমণ্ডল অতিশয় বিমর্ষ বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে একাকী আসিতে দেখিয়া, নন্দিনী বলিল. "পিতা কোথায়?"

মোহনলাল মস্তক অবনত করিয়া কহিল—"তিনি দস্যু হস্তে বন্দী।"

নন্দিনী চমকাইয়া উঠিল, বলিল,—"কেন?"

মোহনলাল গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "মা, তিনি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এই তাঁহার অপরাধ।"

নন্দিনী হৃদয়ে ব্যথা পাইল। আজ তাহার জন্য পিতা দস্যু হস্তে বন্দী। কেন পিতা আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন? মুক্ত না করিলে ত পিতার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত! তবে কেন পলাইয়া আসিলাম?

নন্দিনী কাঁদিতে কাঁদিতে মোহনলালকে বলিল—"আপনার নিকট আমি বহু ঋণপাশে আবদ্ধ। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন—আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আমার জন্য আর একটি কার্য্য করিতে পারেন কি?"

সহানুভূতি সূচক স্বরে মোহনলাল বলিল—"মানুষ মানুষকে আশ্রয় না দিলে কে আশ্রয় দিবে মা? বল কি করিতে হইবে?"

নন্দিনী—"আপনি পিতাকে মুক্ত করিয়া আনিতে পারেন কি?"

মোহনলাল—"মা, গোবিন্দচন্দ্র আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে ভুলিব না। তাঁহার জন্য যা করিতে হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব—তবে তোমার ও আমার অদৃষ্ট।" বলিয়া মোহনলাল গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

তারপর আবার বলিতে লাগিলেন—"তুমি নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান কর—আমি এখন চলিলাম।" বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, যেখানে গোবিন্দচন্দ্র বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন সেই স্থানের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিকাল। গোবিন্দচন্দ্র একটী অন্ধকার নির্জ্জন কক্ষে বন্দী রহিয়াছেন। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া দিগন্তের পানে শূন্য নয়নে চাহিয়াছিলেন। দেখিলেন—আকাশে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন। পৃথিবী জ্যোৎস্নাময়ী, তবে জ্যোৎস্না বড়ই মলীন বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছিল। দীর্ঘ দীর্ঘ শাল বৃক্ষশ্রেণী বাতাসে নড়িয়া উঠিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন—এতদিন বনে, জঙ্গলে, নিশীথ রাত্রে একাকী পরিভ্রমণ করিয়াছি—একদিনের জন্যও ভয় পাই নাই। আজ প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কেন? স্মরণ হইল—শুনিয়াছি, মানুষ মৃত্যুর পূর্ব্বে বিভীষিকা দেখিয়া থাকে। বুঝি আমারও তাই হইল। চক্ষে জল আসিল, আজ যে পৃথিবীর আলোকে, বাতাসে, জলে, বাঁচিয়া আছি, কল্য তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। সেই বিরহের অনুভবে, তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কন্যার কথা মনে পড়িল। স্ত্রীর কথা মনে হইল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আবার মনে ভাবিলেন—আমি কাঁদি কেন? যে হৃদয়ে পত্নী শোক সহ্য করিয়াছি, সে হৃদয় কি এতই দুর্ব্বল? কখনই না। এ হৃদয়কে পাষাণ করিব। সকল দুঃখ বিসর্জ্জন দিব। এইরূপ নানা চিন্তায় মগ্ন। এমন সময়ে গবাক্ষ পথে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দ চন্দ্র জানিতেও পারিলেন না। এমন সময় ধীরকণ্ঠে কে ডাকিল, "গোবিন্দ সর্দ্দার?"

গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন—"কে ?"

উত্তর আসিল—"আমি মোহনলাল।"

গোবিন্দচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, "মোহনলাল! এত রাত্রে এখানে! কিরূপে আসিলে?"

মোহনলাল বলিল—"কেহ জানে না। আমি গোপনে এখানে আসিয়াছি।"

গোবিন্দচন্দ্র—"কেন, কি জন্য এখানে আসিয়াছ?"

মোহনলাল—"সর্দ্দার, শুনিলাম আপনি বন্দী রহিয়াছেন সেজন্য—।"

বাধা দিয়া গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, "নন্দিনী কোথায়?" গোবিন্দচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, তাহা অন্ধকারে মোহনলাল দেখিতে পাইল না। বলিল, "ঐখানেই আছে। মা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন, সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।" গোবিন্দচন্দ্র গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কেন, জানি না। বোধহয় কন্যা তাঁহার মৃত্যু আশু সম্ভাবনা, এই ভাবিয়া। তারপর বলিতে লাগিলেন—

"তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তুমি যে এ সময় আসিবে, তাহা আমার খুব বিশ্বাস ছিল। যাক্, নন্দিনীকে বলিও—আমি মৃত্যুর জন্য কাতর নহি। পলাইতে পারিতাম, আমার সে ক্ষমতা আছে, তবে পলাইব না। এই পত্রখানি

নন্দিনীকে দিও” বলিয়া মোহনলালের হস্তে একখানি পত্র দিলেন।

মোহনলাল বলিল, “আপনি কি তাহা হইলে যাইবেন না, মনস্থ করিয়াছেন?” গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, “হ্যাঁ,তাই।” মোহনলাল অনেক অনুরোধ করিতে লাগিল।

গোবিন্দচন্দ্র ধীরকণ্ঠে বলিলেন, “মোহনলাল—তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না।”

মোহনলাল কাঁদিতে লাগিল। গম্ভীরস্বরে গোবিন্দচন্দ্র ডাকিলেন—“মোহনলাল, তুমি বালকের মত কাঁদিতেছ কেন? ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না।”

মোহনলালের চক্ষুর জল আরও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন গোবিন্দচন্দ্র সস্নেহবচনে বলিলেন—“তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও বন্ধু। এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া আর আমার চিত্ত অস্থির করিও না। পূর্ব্বের সৌহার্দ্দ সব ভুলিয়া যাও।”

মোহনলাল অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরকণ্ঠে বলিল—“সে সৌহার্দ্দ কিরূপে ভুলিব?”

দৃঢ়কণ্ঠে গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন—“ভুলিতে হইবে—কি করিবে? অদৃষ্ট!”

মোহনলাল কোন উত্তর দিল না, নীরবে কাঁদিতেছিল। গোবিন্দচন্দ্র মোহনলালকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, “ভকে

বিলম্ব করিয়া কাজ কি? তুমি ফিরিয়া যাও। আমার এই শেষ কথা রাখ।"

এতদিন মোহনলাল গোবিন্দচন্দ্রের সকল কথাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একথা রাখিতে পারিবে না? এই ভাবিয়া মোহনলাল সে স্থানে আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"তবে চলিলাম।"

গোবিন্দচন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। ভাবিলেন—সারা জীবন পাপ করিয়াছি, এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।

নানা চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া গেল।

সকাল হইলে গোবিন্দচন্দ্রের কক্ষে দুইজন দস্যু আসিয়া প্রবেশ করিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রকে তাহারা দস্যু সর্দ্দারের নিকটে লইয়া গেল। দস্যু সর্দ্দার গম্ভীর স্বরে ডাকিল—"গোবিন্দচন্দ্র।" দৃঢ়স্বরে গোবিন্দচন্দ্র উত্তর করিলেন—; কি? পূর্ব্ববৎ সর্দ্দার বলিল—"তুমি সেই রমণীটিকে মুক্তি দিয়াছ?"

গোবিন্দচন্দ্র—হ্যাঁ

সর্দ্দার। "কাহার আজ্ঞায়?"

গোবিন্দ। "আজ্ঞা! কিসের জন্য। আমি নিজে স্বইচ্ছায়, স্বহস্তে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি।"

সর্দ্দার। "জানিতে না যে, ইহার পরিণাম ভীষণ হইবে।"

গোবিন্দ। "তা আবার জানিতাম না। জানিয়া শুনিয়াই ত এ কার্য্য করিয়াছি।"

সর্দ্দার। "তাহা হইলে এখন বল, তুমি কি চাও? মুক্তি না শাস্তি।"

গোবিন্দচন্দ্র ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"শাস্তি।"

সর্দ্দার। "গোবিন্দচন্দ্র তুমি কি চাও? বল, আমি দিতেছি। তুমি তাহাকে আনিয়া দাও।"

গোবিন্দচন্দ্রের চক্ষু আরক্ত হইল। রোষদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "সর্দ্দার—যে তাহার রক্ষাকর্ত্তা তাহার সম্মুখে এইরূপ কথা বলা তোমার শোভা পায় না।"

সর্দ্দারের রোষবহ্নি পূর্ব্ব হইতেই জ্বলিতেছিল আরও জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "তাহা হইলে তুমি তাহাকে আনিয়া দিবে না।"

গোবিন্দচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিলেন— 'কখন না"

সর্দ্দার—"তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কর।"

গোবিন্দ—"এ পাপী তাহাতে বিচলিত নয়।"

সর্দ্দারের চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হস্তস্থিত বর্শা গোবিন্দের বক্ষে আমূলে বসাইয়া দিল। গোবিন্দচন্দ্র "নন্দ." বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তারপর সব শেষ, সব নীরব। পাপীর রক্তে ধরাতল ভাসিয়া গেল, ক্রমে জনতা নীরব হইয়া আসিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যখন মোহনলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন বেলা এক প্রহর হইয়াছে। নন্দিনী বাটীর সম্মুখের দ্বারে, মোহনলালের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। এমত সময়ে মোহনলাল আসিয়া উপস্থিত হইল। নন্দিনী বলিল—"আপনি একা কেন! পিতা কোথায়?"

মোহনলাল সজলনেত্রে বলিল—"তিনি আসিলেন না।" বলিয়া আর কি বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না। নিরুদ্ধ বাষ্পবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু সজল হইল। মোহনলালের ঐরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নন্দিনী শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "কেন আসিলেন না? তাঁহার কি হইয়াছে?"

মোহনলাল শোকবেগ সংযত করিয়া বলিল, "মা, তুমি ত শুনিয়াছ, তিনি শত্রু হস্তে বন্দী। তাঁহাকে আসিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম, তিনি আসিলেন না।"

নন্দিনী—"কেন?"

মোহনলাল কেনর উত্তর কি দিবে? তাহার চক্ষে জল আসিতেছিল, সেস্থানে আর দাঁড়াইল না।

"তাহা জানি না—তোমাকে এই পত্রখানি দিয়াছেন।" বলিয়া পত্রখানি নন্দিনীর হস্তে দিয়া চলিয়া গেল। নন্দিনী সাগ্রহে পত্র পড়িতে লাগিল।

দুর্গ কক্ষ

কাল—রাত্রি

"মা,

আজ আমি বন্দী। আমার অপরাধ, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি। যখন আমি তোমাকে দুর্গের বাহিরে লইয়া আসিতে ছিলাম, সে সময় যে দস্যু আমাকে দেখিয়াছিল, সে দস্যুসর্দ্দারের কানে এই কথা তুলিয়াছে। যাহা হউক সে জন্য আমি দুঃখিত নহি জানিবে। আমি এ স্থান হইতে পলাইয়া যাইতে পারিতাম ও এখনও যাইতে পারি। কেহ বিন্দুমাত্র জানিতেও পারিবে না, কিন্তু আমি পলাইব না। যদি জিজ্ঞাসা কর কেন? তাহা হইলে বলিব—আমার হৃদয় দুর্ব্বল নহে। দোষ করিয়াছি, তাহার শাস্তি লইতে কুণ্ঠিত নহি। জানি কল্য প্রাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তবুও চোরের মত পলাইব না। জীবনে যে কত অপকর্ম্ম করিয়াছি—তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষণে ফল ভোগ করিতে হইবে, সেজন্য কাতর নই।

যাক্ তোমাকে একটা কথা বলি। যদি কোন দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সে কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম, বহুদিন হইতেই হৃদয়ে সে ইচ্ছা ছিল। আজ সে আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

মা! তুমি আমারই কন্যা। তখন তুমি দুই বৎসরের শিশু।

তুমি, তোমার প্রসূতি, ও আমি গোযানে গোপালনগর—তোমার মাতুলালয় যাইতেছিলাম। সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি ও তোমার মাতার শরীরে যথেষ্ট অলঙ্কার ছিল। কারণ তোমার মাতামহ ধনী লোক ছিলেন। ধনীর কন্যা পিত্রালয়ে আসিতেছে, এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আমরা একটি সুদীর্ঘ ও নীবিড় বন পার হইতেছিলাম। দুই ধারে বন, মধ্যে অপ্রশস্ত পথ। এমন সময় কতকগুলি লোক হাতে মোটা মোটা লাঠি আমাদের নিকট হইতে প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইত্যবসরে গোযানের পশ্চাৎদিকের ঢাকনা খুলিয়া ফেলিয়া নামিয়া, গাড়ীর বিপরীতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে পথে আসিয়াছিলাম, সে পথ ধরিয়া আর গমন করিলাম না। বহুদূর গমন করিবার পর, একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম। তখন চাঁদ উঠিয়াছে। তোমার মাতা ধনীর কন্যা। কখন পথ হাঁটে নাই। সুতরাং তাহার ক্লান্তি আসিল। পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পুষ্করিণী হইতে শীতল বারি লইয়া আসিলাম, সে পান করিল, কিঞ্চিৎ কপোল সিঞ্চন করিল। হঠাৎ দূরে যেন কাহাদের কোলাহল শুনিতে পাইলাম। ভাবিলাম বুঝি দস্যুগণ আমাদের অনুসন্ধানে আসিতেছে। ভয় হইল, সেখানে আর অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। সে স্থান

হইতে অবিলম্বে পলাইলাম। কিছুদূর গমন করিলাম, তবুও কোলাহল নিকটে বোধ হইতে লাগিল। আমরা শেষে দৌড়াইতে লাগিলাম, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া শেষে যখন বনের অপরপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন তাহাদের কোলাহল আর শোনা গেল না। হঠাৎ তোমার মাতা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—আমার মেয়ে? তখন আর কি বলিব—খুঁজিয়া পাইলাম না। বিশ্ব সংসার অন্ধকার দেখিলাম। মনে হইল, চন্দ্র সমস্ত আকাশ জুড়িয়া উল্কাবেগে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। তখন আর কি করিব! যদি তোমার সন্ধানে গমন করি, তাহা হইলে তোমার জননীকে কোথায়—একা রাখিয়া যাইব! পরন্তু তোমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া অনুসন্ধান করিতে যাওয়াও বিপজ্জনক। অগত্যা কল্য তোমার সন্ধান হইবে এইরূপ আশ্বাস দিলাম। যে স্থানে আমরা গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, সে স্থানে মনুষ্যের বসতী নাই। দূরে একটী জীর্ণ ও পুরাতন শিব মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দির মধ্যে শিব লিঙ্গ নাই, দ্বারের কপাটও নাই। কি করিব ভয়ে ভয়ে অন্ধকারেই রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সেই স্থানে তোমার মাতাকে রাখিয়া সেই পুষ্করণীর নিকটে তোমার অনুসন্ধানে গমন করিলাম।

কিন্তু বৃথাই হইল। হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম।

তোমার মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। সে স্থানে আর অধিক্ষণ তিষ্ঠাণ স্ুবিবেচনা মনে করিলাম না। এ পর্য্যন্ত কাহারও আহার হয় নাই। সুতরাং গ্রামের অনুসন্ধানে গমন করিলাম। গ্রামও পাইলাম। গ্রামে আসিয়া আবার তোমায় অনেক অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু তোমার কোন সংবাদ পাইলাম না। পরদিন গৃহে ফিরিয়া গেলাম। দুই দিবস পরে তোমার মাতা মারা গেলেন। মনে বড় অশান্তি জন্মিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইলাম। যে পথে দস্যুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া যাইতেছিলাম। একদল দস্যুও সেই পথে যাইতেছিল। তাহাদের সহিত আলাপ হইল। তাহাদের দলে দলভুক্ত হইলাম। তুমি আশ্চর্য্য হইলে বোধ হয়—আমায় এইরূপ মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছিল কেন? বোধ হয় জান না। যদি কোন দিন তোমার অনুসন্ধান করিতে পারি—এই আশায় দস্যুদলে দলভুক্ত হইলাম। এইরূপে বহুদিন গেল। কিন্তু তোমার সন্ধান পাই নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে সেজন্য দুঃখ করিও না। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাইবে কে? তাহা না হইলে রামচন্দ্র—যিনি নারায়ণের অংশ তিনি সীতা হারাইবেন কেন? সকলই কপালের দোষ। তাহা না হইলে পোড়া মাছ কখন জীবিত হইয়া জল মধ্যে পলাইতে পারিত না, অভিমন্যুও যুদ্ধে মারা যাইত না। যাক্ তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। সুখের বিষয় এই যে তোমাকে

জীবনে আর একবার দেখিতে পাইলাম। তুমি শীঘ্র ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। কারণ আমাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইবে না। নিশ্চয় তাহারা তোমার অনুসন্ধান করিবে। মা! তবে বিদায়—আশীর্ব্বাদ করি তুমি স্বামীর চরণতলে নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া যাও। আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, স্ত্রীলোকের ঐ আশীর্ব্বাদই ভাল। ইতি।

তোমার হতভাগ্য পিতা।

পত্র পাঠ সমাপনান্তে নন্দিনীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্রমে শোক বেগ অসহ্য হইল। মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমির উপর লুটাইয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রজনী গভীরা ও ভীষণা। আকাশমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-পুঞ্জে ছাইল। গ্রাম, মাঠ, বন, নদী, পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। কচিৎ বাতাসের প্রবল তাড়না হেতু মেঘপুঞ্জের দ্রুত সঞ্চালনে তাড়কাবলি মুহূর্ত্তের জন্য নয়ন পথে পড়িয়া আবার অদৃশ্য হইল। শোঁ শোঁ শব্দে বায়ু গর্জ্জিতে লাগিল। মর্ম্মর ধ্বনি আরম্ভ হইল। এই ভীষণা রজনীতে নন্দিনী একাকী এই নির্জ্জন বন-প্রদেশে। অন্ধকারে পথ লক্ষ্য হয় না। ধীরে ধীরে চলিয়াছে। কখন কোন শব্দ হেতু পশ্চাৎ পানে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ আসিতেছে কি না? নন্দিনীর হৃদয় ভয় শূন্য। আজ আর প্রাণের মায়া নাই। নগেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগী হইয়াছেন, পত্রে জানিতে পারিয়া সে আজ পথে বাহির হইয়াছে। আজ নন্দিনী মরিবে সংকল্প করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ শৃগালের উচ্চরবে, বায়ুর বিক্ষুব্ধ গর্জ্জনে, বৃক্ষের মর্ম্মর ধ্বনিতে, ভয় নাই। মাথার উপর পেচক গম্ভীর আরাবে ডাকিয়া উঠিল। ওঃ কি। নন্দিনী তোমার ভয় নাই। তুমি চলিয়াছ—কোথায়? শৃগালের শব্দ শুনিলে না। তবু যাইতেছ! তোমার ভয় পাইতেছে না! পদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতা, কাঁটা, বাধা দিতেছে, তথাপি বৃক্ষের বাধা, লতার বিসর্পি বন্ধন, কাঁটার যাতনা, উপেক্ষা করিয়া আজ চলিয়াছ—কোথায়?

হঠাৎ বন-মধ্যে মড়্ মড় করিয়া শব্দ হইল। নন্দিনী শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীষণ গর্জ্জনে ঝড় আসিয়া দেখা দিল। প্রথমে পট্ পট্ তারপর মুষল ধারে বৃষ্টি নামিল। শৃগাল বিবরে লুকাইল, পতঙ্গ পত্রের আড়ালে আশ্রয় লইল, চন্দ্রমা মেঘের মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া লইল, কিন্তু নন্দিনী নিরাশ্রয়া। তাহার সমস্ত দেহ জলসিক্ত হইল, শীতে থর থর কাঁপিতে লাগিল।

বর্ষনশীল ঘোর তমোময়ী মেঘপুঞ্জ হইতে সৌদামিনী প্রকাশিল। গুরু গুরু রবে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নন্দিনী ভাবিল— "বুঝি জীবন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর বিলম্ব নাই। হায়। সে কোথায় আর আমি কত দূরে। তাহার সঙ্গে জীবনে বোধ হয়, আর সাক্ষাৎ হইল না।" নন্দিনী সারা জীবন কাঁদিয়াছে— এখনও কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দনের বিরাম নাই। আজ অশ্রু আর বিরাম মানিতে চাহে না। শোকবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পদচালনেরশক্তি কোথায়—অন্তর্হিত হইয়া গেল। নন্দিনী বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে বৃষ্টি থামিয়া গেল, ঝড় হ্রাস পাইল। মেঘও কাটিয়া গেল। সেই মসীময়ী আকাশ হইতে চন্দ্রদেব দেখা দিলেন। নীলগগণ চন্দ্রালোকে স্নাত হইয়া হাসিতে লাগিল।

চন্দ্রালোকে দেখিতে পাওয়া গেল, আশ্রয়হীনা নন্দিনী পথিপার্শ্বে ধুল্যবলুণ্ঠিতা লতিকার ন্যায় ধুলায় লুণ্ঠিতা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পুরী যাইবার প্রশস্ত পথ। পথের ধারে বৃক্ষশ্রেণী। দূরে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। কাঁকড় বিছান পার্ব্বত্য পথ। এই পথের পার্শ্বেই নন্দিনী মূর্চ্ছিতা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

ক্রমে ভোর হইল। পথভ্রমণজনিত শ্রান্তি হেতু নন্দিনীর দেহ অবসন্ন, চক্ষু কোটরাগত। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। বোধহয় নন্দিনীর আসন্ন কাল সমুপস্থিত। নন্দিনী চক্ষু বুজিয়া আছে। তন্দ্রাবস্থায় তাহার মনে হইল—যেন একটী প্রকাণ্ড শ্বেত হস্তী ধীরে ধীরে তাহাকে শুণ্ডে করিয়া পৃষ্ঠে তুলিয়া, কোথায় লইয়া চলিল। হস্তী চলিয়াছে, তারপর বহুদূরে এক মনোহর কুঞ্জ মধ্যে তাহাকে নামাইল।

নন্দিনীর তন্দ্রা ঘোর কাটিয়া গেল। বোধ হইল যেন তাহার মস্তক একটী কোমল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। চাহিয়া দেখিল, কাহার জানুপরি তাহার মস্তক সুযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। নন্দিনী পাশ ফিরিয়া চাহিতে দেখিল, একটী গুম্ফ শ্মশ্রুযুক্ত সন্ন্যাসী ধীরভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন। সন্ন্যাসী নন্দিনীকে ঈষৎ নড়িতে এবং চক্ষুন্মীলন করিতে দেখিয়া ডাকিলেন—"নন্দা?"

সে স্বরে নন্দিনী চমকাইয়া উঠিল, বলিল—"কে? কে আপনি?"

সন্ন্যাসী নন্দিনীর মুখপানে স্থীর দৃষ্টিতে চাহিয়া, ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"নন্দা—আমি।"

নন্দিনী অধিরভাবে বলিয়া উঠিল—"কে? কে তুমি? বল। বল কে তুমি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নন্দা—আমি। আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। আমি—তোমার স্বামী।" উত্তেজিত কণ্ঠে নন্দিনী বলিল, "কে! স্বামী। নন্দার স্বামী! প্রভু।"

সন্ন্যাসীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। এই সন্ন্যাসী নগেন্দ্রনাথ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি সন্ন্যাসী বেশে গৃহ ত্যাগ করিয়া যান। তিনি পুরী যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীগণ অগ্রে গমন করিলে তিনি পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। পথে নন্দিনীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, এই ছায়াযুক্ত নির্জ্জন স্থানে লইয়া আসেন।

নন্দিনীর মৃত্যুকাল আসন্ন। নন্দিনী কাঁদিতে লাগিল। সে কান্নার বিরাম নাই। আজ কত দিন পরে, স্বামীকে পাইয়া ক্ষত হৃদয় উছলাইয়া উঠিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথও কাঁদিতে ছিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তন্ময়চিত্তে নন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন—"তাঁহার সেই নন্দা।"

নন্দিনীর শোকবেগ উপশম হইলে, বলিল, "প্রভু, আপনার এ বেশ কেন?"

নগেন্দ্রনাথ কি বলিবেন? মহা গণ্ডগোলে পড়িলেন। নন্দিনী নগেন্দ্রনাথকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল—"আমাকে বলিলে না। আমি আর জিজ্ঞাসা করিতে আসিব না।"

নগেন্দ্রনাথের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সব খুলিয়া বলিলেন। নন্দিনী হাসিল।

বহুদিন সে হাসে নাই—আজ একবার হাসিল। যেন ঘোর তমোময়ী রজনী কাটিয়া চন্দ্রোদয় হইল। যেন অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোক ছটা দেখা দিল। নগেন্দ্রনাথ বহুদিন সে হাসি দেখেন নাই—আজ তন্ময়চিত্তে সে হাসি দেখিতেছেন।

নন্দিনী বলিল—"প্রভু, বলিয়াছিলাম তোমার নন্দা তোমার চরণ দর্শন না করিয়া মরিবে না। মনে আছে?"

নগেন্দ্রনাথ মৃদু স্বরে বলিলেন, "আছে।"

নন্দিনী বলিল—"আমার আসন্নকাল উপস্থিত। আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না।"

নন্দিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দার ওষ্ঠে, গণ্ডে, বক্ষে, সে জল পড়িল। নন্দা বলিল, "প্রভু—সারা জীবন কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। আর কাঁদিও না। তোমার হাসি-মুখ দেখিয়া মরি। তোমার পদরেণু আমার মাথায় দাও।" বলিয়া নগেন্দ্রের চরণের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিল। নগেন্দ্রনাথ পদদ্বয় বাড়াইয়া

দিলেন। নন্দিনী মস্তকে পদধূলি লইল। তারপর বলিতে লাগি "আমি চলিলাম—মনে দুঃখ করিও না। আমার বড় সাধ ছিল, তোমার চরণ দর্শন করিয়া মরিব। সে সাধ আজ মিটিল। আমার আর কোন দুঃখ নাই। তুমি আর কাঁদিও না। আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও। তোমার হাসিমুখ দেখিয়া মরি।"

নগেন্দ্রনাথ কেবল কাঁদিতেছিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। বহুবার কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না। যাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার কথা বলিবার শক্তি কোথায়? এদিকে নন্দার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, নন্দার আর বিলম্ব নাই।

বহুকষ্টে শোকবেগ দমন করিয়া নগেন্দ্রনাথ একবার ডাকিলেন, "ন—ন্দা।" আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। নিরুদ্ধ বাষ্পবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তাঁহার বক্তব্য বলা হইল না, কেবল চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষীণকণ্ঠে নন্দিনী উত্তর দিল, "প্র—ভু" আর কিছুই বাহির হইল না। চক্ষু দিয়া বারি ঝরিতে লাগিল। হঠাৎ নিমেষ মধ্যে চক্ষুর জল থামিয়া গেল। চক্ষু স্থির, নিস্তব্ধ হইল। নগেন্দ্র বুঝিলেন—সব শেষ হইয়াছে।

উপসংহার

নন্দিনী বহুদিন মারা গিয়াছে, নগেন্দ্রনাথও কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের উদ্যান মধ্যে সরোবর খনন হইয়াছে সরোবরের জল নীলাকাশের মত স্বচ্ছ। জলে পদ্ম শালুক ফুটিয়াছে। সরোবরের চারি পাড়ে মখমলের মত কোমল তৃণে আচ্ছাদিত। তাহার মধ্যে মধ্যে তাল নারিকেল বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। উদ্যানের মধ্যে কত ফুলের কেয়ারী। সোপানশ্রেণী মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত। সোপানোপরি মঞ্চের উপর মাধবীলতার ছাউনি। কোথাও উচ্চ বেদীর উপর সিংহের, ব্যাঘ্রের, পরীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। একটী সন্ন্যাসী এই উদ্যানে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। শেষে সরোবরের সোপানোপরি যে, বৃহৎ মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত একটী স্তম্ভ আছে, সেই স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে কি লিখা আছে, তাহা পড়িতে লাগিলেন।

"নগেন্দ্র নন্দিনী সরোবর"

এই সরোবর বাঙ্গালা ১৩৩ অব্দে নন্দীগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী 'নন্দিনীর' পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠা করিলাম।

১৩৩ অব্দের ১৪ বৈশাখ } শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত।
নন্দীগ্রাম।

পড়িয়া, সন্ন্যাসী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। ধীরে ধীরে স্তম্ভের নিম্নে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। কেন কাঁদিতে ছিলেন, বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ স্তম্ভের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তন্ময় চিত্তে দেখিতেছিলেন। সে অক্ষরে কি ছিল, তাহা সন্ন্যাসীই জানেন।

নন্দিনীর মৃত্যু হইয়াছে, নগেন্দ্রনাথ ত অনেক দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তবে সন্ন্যাসী কাঁদিতেছেন কেন? এযে কেবল স্মৃতিমাত্র।

সন্ন্যাসী, নগেন্দ্র ও নন্দিনীকে বোধ হয় চিনিতেন। সন্ন্যাসী কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে উঠিলেন। ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া, জল সন্নিকটে গমন করিলেন। মুখ হস্ত প্রক্ষালন করিলেন, কিন্তু জলে পদ স্পর্শ করিলেন না। কেন—জানিনা। তাহার পর স্তম্ভের নিকটে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে চিৎকার করিয়া ডাকিলেন—'নন্দিনী'। কেহ উত্তর দিল না। তিনি উদ্যান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন—কোথায়? কে—জানে?

সমাপ্ত